গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ২১ - ২৭ জানুয়ারি ২০২২ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com | আট পাতা | পৃ. ১

হাসপাতালে ২৮৩ রকম ওষুধ বন্ধ করল তৃণমূল সরকার

তীব্র প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

সম্প্রতি রাজ্য সরকার যেভাবে হাসপাতালে ওষুধের তালিকায় ছাঁটাই করেছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জনিয়ে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে বলেছেন, "সম্প্রতি এক নির্দেশনায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর মহকুমা ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলোতে সরবরাহ করা অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় যেখানে ৬৪৪টি ওষুধ সরবরাহ করা হত সেখানে এখন থেকে তা কমিয়ে ৩৬১ করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, নিউমোনিয়া সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রোগের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একাধিক ওষুধ এবং একই ওষুধের বিভিন্ন মাত্রা লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।"

২০২১-এর নভেম্বরে তৃণমূল সরকার এক প্রস্থ ওষুধ ছাঁটাই করেছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে একইভাবে সরবরাহ করা ওষুধের তালিকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ওষুধের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং শহরের রেফারেল হাসপাতালগুলিতে আরও চাপ বাড়বে।

ক্ষোভের সাথে কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলির চিকিৎসার একমাত্র আশ্রয়স্থল সরকারি হাসপাতাল। কিন্তু ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী সহ বেড, ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপ্রতুলতায় মুমূর্ষু রোগী এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতলে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়, না হলে বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় মারা যায়। এমতাবস্থায় মহকুমা স্তর থেকে সাব-সেন্টার পর্যন্ত জীবনদায়ী সহ সমস্ত আবশ্যকীয় ওষুধ কমানোর সরকারি নির্দেশ চূড়ান্ত জনবিরোধী। অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। প্রসঙ্গত পূর্বতন সিপিএম সরকারও ১৯৯৯ সাল থেকে একাধিকবার হাসপাতালে ওষুধ ছাঁটাই করেছিল। যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এসইউসিআই (সি)।

রঙচঙে স্টেশনই সার যাত্রী নিরাপত্তা কোথায়!

যে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার রেলের উন্নতি বলতে স্টেশনে শপিং মল তৈরি, ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক বেচে ব্যবসা করা বোঝে, যাত্রী পরিষেবার উন্নতি বলতে বোঝে ট্রেন থেকে স্টেশন, লাইনের ধারের জমি সহ সব সম্পত্তি একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের হাতে বেচে দেওয়া—সে দেশে রেলযাত্রায় সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার হাল কী হতে পরে তা আর একবার বুঝিয়ে দিয়েছে উত্তরবঙ্গের দোমোহনিতে ১৩ জানুয়ারির ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনা আবার দেখিয়ে দিল রেলযাত্রী এবং জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার কতটা উদাসীন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে নিজেই যা বলেছেন, তাতে বোঝা যায় যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের হাল কতটা শোচনীয়।

রেলের রক্ষণাবেক্ষণের দশা কতটা বেহাল হলে একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে এমন লজঝড়ে ইঞ্জিন জোড়া হতে পারে যে, তার যন্ত্রাংশ খুলে ঝুলতে থাকে! উত্তরবঙ্গে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারে কয়েক বছর আগেই ওভারহেড বিদ্যুৎ

দুয়ের পাতায় দেখুন

সব কিছু খোলা, শুধু স্কুল-কলেজ খুলতে কেন আপত্তি?

প্রশ্ন সেভ এডুকেশন কমিটির

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর ১৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া এক পত্রে অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবি জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন,

রাজ্য বিপর্যয়মোকাবিলা কমিটির জারি করা এক নির্দেশিকায় বিয়েবাড়ি সহ সামাজিক অনুষ্ঠানে জমায়েতের সংখ্যা ৫০ জন থেকে বাড়িয়ে ২০০ জন করা হয়েছে, মেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে ৫০ শতাংশ উপস্থিতি সহ শপিংমল, বড় বাজার কমপ্লেক্স, সিনেমা ও থিয়েটার হল, পানশালা, রেস্তোঁরা,সেলুন-বিউটি পার্লার খোলা রাখার নিয়ম আগের মতোই বজায় থাকছে, অথচ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কমিটি নীরব। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল প্রায় ২ বছর বন্ধ, স্কুলের উচ্চতর শ্রেণিগুলি এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুললেও তা আবার বন্ধ হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, ছাত্ররা মানসিক সমস্যার শিকার হচ্ছে। স্কুল আবার বন্ধ হওয়ায় এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকরা নিজস্ব উদ্যোগে ছাত্রদের নানাভাবে অফলাইনে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করছেন যা অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া সম্ভব হত না। এই অবস্থায় স্কুল খোলা অত্যন্ত জরুরি। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের টিকাকরণের মধ্য দিয়ে দ্রুত স্কুল খোলা সম্ভব। একদিনের মধ্যে রাজ্যের একটি লোকসভা কেন্দ্রে যদি ৫০ হাজারের বেশি নাগরিকের টিকাকরণ সম্ভব হয় তা হলে যে বয়সের ছাত্ররা টিকা পেতে পারে তাদের সকলকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে টিকার ব্যবস্থা করা যায়।

শিক্ষার এই মারাত্মক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে তাঁর দাবি, অবিলম্বে টিকাকরণের ব্যবস্থা করে কোভিড বিধি মেনে সমস্ত স্তরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে হবে এবং ২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ক্লাসরুমে নিতে হবে।

রেল প্রকল্পের নামে উচ্ছেদ, বিক্ষোভ কেরালায়

কেরালার সিপিএম সরকার কে-রেল সিলভার লাইন প্রকল্পের নামে ২০ হাজার পরিবারকে উচ্ছেদ করছে এবং এই প্রকল্পে রাজ্যের পরিবেশেরও বিপুল ক্ষতি হবে। এই প্রকল্প বাতিলের দাবিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। ১২ জানুয়ারি কেরালায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল।

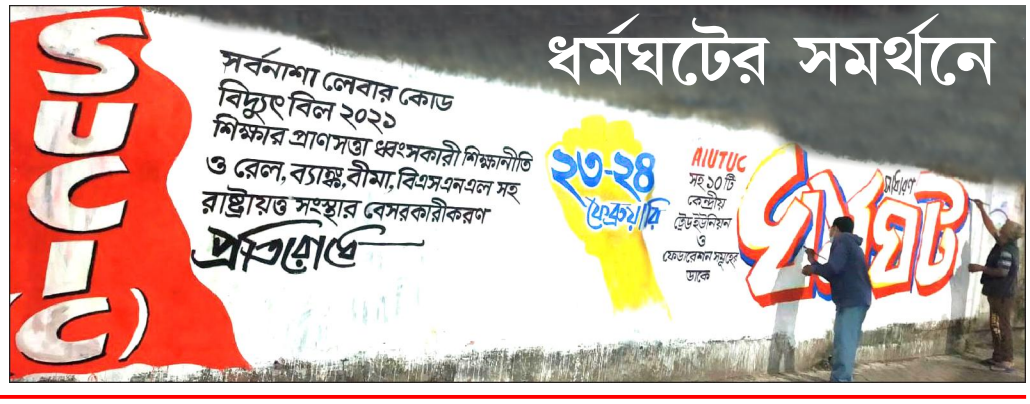

রঙচঙে স্টেশনই সার
যাত্রী নিরাপত্তা কোথায়!

একের পাতার পর

লাইন চালু হয়েছে। অথচ নিউজলপাইগুড়ির মতো বড় স্টেশনে এমনকি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোথাও বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিনের মেরামতি বা খরাপ ইঞ্জিন বদলে দেওয়ার মতো পরিকাঠামোটুকুও গড়ে তোলেনি রেল কর্তৃপক্ষ। রেলমন্ত্রী নাকি ফটোগ্রাফারদের সাক্ষী রেখে একেবারে ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে পরীক্ষা চালিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে তাঁর পরিচালিত রেলে ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ খুলে পড়ে গিয়েই ট্রেন বেলাইন হয়েছে। জনসাধারণ এবং রেলযাত্রীদের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে এরপর রেলমন্ত্রীর মুখ লুকানোই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেল তিনি তাঁর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মতোই নির্লজ্জ। গঙ্গায় শত শত মানুষের লাশ ভাসতে দেখেও প্রধানমন্ত্রী যেমন উন্নয়নের বাণী দেন ক্যামেরার সামনে। রেলমন্ত্রীও তাই করলেন।

অথচ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে পূর্বতন কংগ্রেসের মতোই ট্রেনের টিকিটের উপরে সেফটি সারচার্জ, ডেভলপমেন্ট সারচার্জ বসিয়ে চলেছে। ২০১৮ সালে বিজেপি সরকারের এক রেলপ্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রতিদিন রাতে তিনি শতাধিক বছরের পুরনো রেল ব্রিজগুলি নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেন। তিনি যে সত্যিটা বলেননি, রেলযাত্রা সাধারণ যাত্রীদের কাছে প্রতিদিনের দুঃস্বপ্নের বিষয়ই হয়ে উঠেছে। এর সুরাহা করার জন্য তাঁরা কী করেছেন? তাঁরা রেল লাইন, ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণের কাজের বেশিরভাগটাই তুলে দিচ্ছেন বেসরকারি ঠিকাদারদের হাতে। রেলের অভিজ্ঞ স্থায়ী গ্যাংম্যান, লেভেল ক্রশিংয়ের গেটম্যানরা তাঁদের এলাকার লাইনকে নিজের হাতের তালুর থেকেও বেশি চিনতেন। সেই কর্মীদের বদলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চুক্তি ভিত্তিক ঠিকাদার দিয়ে এইসব কাজ করাবে। সাড়ে তিনলক্ষের বেশি অভিজ্ঞ কর্মী, যাঁরা নিরাপদ রেলযাত্রার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতেন, তাঁদের জোর করে অকালে ভিআরএস নিতে সরকার বাধ্য করেছে।

এখন চলছে স্টেশন ডেভলপমেন্টের নামে সেগুলিকে বেসরকারি কোম্পানির হাতে বেচে দেওয়ার কাজ। স্টেশনে বড় বড় কোম্পানিকে ব্যাবসার সুযোগ করে দিলেই নাকি উন্নয়ন হবে! এই উন্নয়নের অজুহাতে সাধারণ যাত্রীদের টিকিটের উপর ১০ থেকে ৫০ টাকা চার্জ বসেছে। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার রেল কোচ তৈরির কারখানাগুলিকে করপোরেট কোম্পানিতে পরিণত করেছে যাতে এগুলি বেচা যায়। ইঞ্জিন তৈরির কারখানাগুলিকেও একদিকে বেসরকারি হাতে বেচতে চাইছে অন্যদিকে রেলের নিজস্ব কারখানায় উন্নত মানের ইঞ্জিন বানানোর পরিকাঠামোকে দুর্বল করে বিদেশ থেকে ইঞ্জিন আমদানি করছে। এতে নেতা-মন্ত্রীদের কাটমানি খাওয়ার সুযোগ বাড়লেও যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তা যে এতটুকু বাড়েনি তা একের পর এক দুর্ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী একাধিক বেসরকারি ট্রেন চালু করে তার গুণগান করে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা গল্প শোনাচ্ছেন বেসরকারি তেজস এক্সপ্রেসের মতো অত্যাধুনিক ট্রেন অতিদ্রুত ছুটবে, তার জন্য বিশেষ রেললাইন পাতা হবে। প্রধানমন্ত্রী বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন ফেরি করছেন। রেল নাকি একেবারে অত্যাধুনিক সব কোচ বানাচ্ছে, যাতে দুর্ঘটনা হলেও একটি কোচ অপরটির মধ্যে ঢুকে গিয়ে মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটবে না। অথচ দোমোহনীর ঘটনায় দেখা গেল রাজস্থান থেকে গৌহাটি এইরকম বিশাল দূরত্বের একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে ব্যবহার করা হয়েছে মান্ধাতার আমলের কামরা এবং বহু পুরনো লজঝড়ে ইঞ্জিন। রেলমন্ত্রী নিজেই যে ইঞ্জিনের 'গুণমানের' কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ রেলের কর্মীরাই জানাচ্ছেন, আধুনিক প্রযুক্তির কোচ রেলের হাতে আছে। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ সাধারণ যাত্রী যে সমস্ত ট্রেনে যাতায়াত করেন সেগুলিতে এই সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তির কোচ ব্যবহারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ আদৌ ইচ্ছুক নন। রেল জোনগুলিতে কিছু আধুনিক কোচ দেওয়া হলেও তার বেশিরভাগটাই বাতানুকুল। স্লিপার ক্লাস, দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য আধুনিক কোচ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে অধিকাংশ যাত্রী কার্যত প্রাণ হাতে করেই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

রেলের কোচ রক্ষণাবেক্ষণের স্তরে স্তরেও স্থায়ী কর্মীর বদলে ঠিকা কর্মী দিয়ে কাজ, আউট-সোর্সিং এবং বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে। একদল স্বার্থান্বেষী এবং করপোরেট সংবাদমাধ্যম প্রচার করে, এতেই উন্নয়ন হবে, কাজের প্রতি কর্মীদের দায়বদ্ধতা বাড়বে। দোমোহনীর দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিল সরকারের এই নীতি জনগণের জীবনের ক্ষেত্রে কতটা বিপজ্জনক।

দুর্গতদের উদ্ধার ও সহায়তায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা

ওই দিন দুর্ঘটনার পরেই ওই এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে মিলে এসইউসিআই(সি) দলের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সন্ধ্যা নেমে আসায় আলো-আঁধারের মধ্যেই মারাত্মক আহত প্রায় তিনশোর বেশি মানুষকে উদ্ধারে হাত লাগান। দুর্ঘটনার দু'ঘন্টা পরে রাজ্য এবং রেল পুলিশ এসে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। পরবর্তী উদ্ধার কাজে সাধারণ মানুষকে আর থাকতে দেওয়া হয়নি।

এলাকার মানুষের সাথে মিলে দলের কর্মীরা আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করতে প্রশাসনকে সাহায্য করেন। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেখানে আহতদের ভর্তি করা হয়েছে, সেখানে ভর্তি আহতদের জন্য রক্তদান করতে ছাত্র-যুবদের কাছে আহ্বান জানায় এআইডিওয়াইও এবং এআইডিএসও। দেখা যায় মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ হাসপাতালে রক্ত দিতে উপস্থিত হন। যে তিনটি হাসপাতালে আহত যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে দলের স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত থেকে রক্তদান সহ বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এআইডিওয়াইও এবং এআইডিএসওর আয়োজনে থেকে ৪০ জন রক্তদাতা রক্ত দেন।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন বা আহত হয়েছেন, তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ১৩ জানুয়ারি দলের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, স্থানীয় মানুষ যেভাবে অতি দ্রুত উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন তার জন্য দলের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। তিনি দাবি করেন, দুর্ঘটনায় হতাহতদের সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আহতদের উন্নত চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব এবং তাঁদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। দুর্ঘটনার উচ্চপর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা অতি দ্রুত করতে হবে। রেলের যে নীতির জন্য এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা যে কোনও সময় ঘটার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে, তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কমরেড সুজিত ঘোষ দাবি করেন, আহতদের চিকিৎসার যাতে কোনও রকম ত্রুটি না ঘটে, কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারকেই তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

কাজাখস্তানের গণবিক্ষোভ প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

কাজাখস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সে দেশের সংগ্রামী শ্রমিক, যুবক ও সাধারণ মানুষের লড়াইকে সর্বাত্মক সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ১২ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছে, কাজাখস্তান সরকার আন্দোলকারী জনগণের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি নামিয়ে নৃশংস অত্যাচার করছে, ইতিমধ্যেই ১৬০ জন শ্রমিককে হত্যা করেছে, ২০০০-এর বেশি শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে, ৬০০০ এর বেশি জনকে আটক রেখেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্র সহ যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে কাজাখস্তানের জনগণ লড়ছেন, সেগুলির জন্য দায়ী ৩০ বছর আগে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংস ও পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনাই জনগণের এই প্রবল বিক্ষোভের কারণ। পুঁজিবাদী সরকার যে উদারিকরণ-বিশ্বায়নের পথে চলছে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাস্তায় নেমেছে সে দেশের শ্রমিক ও জনসাধারণ। এই বিশ্বায়ন-উদারিকরণের ফলে জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য সে দেশের শাসকশ্রেণি মৌলবাদ ও জাতিবিদ্বেষ উসকে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে।

আরও উদ্বেগের বিষয়, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, চীন, তুরস্ক সহ অন্যান্য দেশ নানা অজুহাতে কাজাখস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চাইছে। এমনকি কাজাখস্তানের শাসকশ্রেণি আন্দোলন দমন করতে রাশিয়ার সাহায্য চাইছে। এ অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল ব্যর্থ করার জন্য, কাজাখস্তানের শ্রমিকশ্রেণি এবং এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে এসইউসিআই(সি)।

আন্দোলনের ওপর পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার বন্ধ করা, শহর থেকে মিলিটারি অপসারণ, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, চীনের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ, কাজাখস্তানে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান, বিদেশি কোম্পানিগুলির সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল করার, ধর্মঘট ও মিটিং-মিছিল করার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন সে দেশের শ্রমিকরা। তাঁরা কাজাখস্তানের ধন-সম্পদ, শিল্প, কাঁচামাল সহ সব কিছু শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরের দাবিতে লড়ছেন। কাজাখস্তানের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতি সংহতি ও সমর্থন জানিয়ে ভারত তথা বিশ্বের জনসাধারণ ও শ্রমিকদের তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

ভি আই লেনিন

মানবমুক্তির দর্শন হিসাবে মার্কবাদকে জানতে ও বুঝতে দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে তার সহায়ক হিসাবে আমরা কার্ল মার্কসের জীবন ও মার্কসবাদ সম্পর্কিত লেনিনের লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার চতুর্থ কিস্তি।

(৪)

উদ্বৃত্ত মূল্য

পণ্য উৎপাদনের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে টাকা (মানি) রূপান্তরিত হয় পুঁজিতে। পণ্য চলাচল বা সঞ্চালনের সূত্র ছিল ঃ পণ্য-অর্থ-পণ্য, অর্থাৎ একটি পণ্য কেনার জন্যে অন্য পণ্য বিক্রি করা। অন্য দিকে, পুঁজির সাধারণ সূত্র হল ঃ অর্থ-পণ্য-অর্থ। অর্থাৎ পণ্য কেনা হচ্ছে বিক্রির জন্য (মুনাফা সহ)। সঞ্চালনে ঢালা টাকার প্রাথমিক মূল্যের ওপর যে বৃদ্ধি ঘটে, মার্কস তাকেই বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিবাদী সঞ্চালন ব্যবস্থায় টাকার এই 'বৃদ্ধির' ঘটনাটা সকলের জানা। বস্তুত, এই বৃদ্ধিই ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত বিশেষ একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক হিসাবে টাকাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করে। পণ্যের সঞ্চালন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না, কেন না পণ্য সঞ্চালনে শুধু তুল্যমূল্যেরই বিনিময় ঘটে থাকে। দাম বাড়িয়ে দিলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না। কেন না ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের লাভ, অপরের লোকসান পরস্পর সমান হয়ে যায়। যদিও বিষয়টা ব্যক্তিগত নয়, একটা ব্যাপকতর, গড় এবং সামাজিক ঘটনা। উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে হলে 'টাকার মালিককে অবশ্যই বাজারে এমন একটি পণ্য উপস্থিত করতে হবে, যার ব্যবহার-মূল্যটাই মূল্যের উৎস হবার মতো একটা স্বকীয় গুণের অধিকারী' (৩৪) — তাকে হতে হবে এমন একটি পণ্য, যাকে ভোগ করার প্রক্রিয়াটাই হল একই সাথে মূল্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া। আর এরকম পণ্য সত্যিই আছে— তা হল মানুষের শ্রমশক্তি। তার ভোগ মানে শ্রম, এবং শ্রম থেকেই মূল্যের সৃষ্টি। টাকার মালিক শ্রমশক্তি কেনে তার মূল্য দিয়ে। অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতোই শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমসময় দিয়ে (যা হল সপরিবারে শ্রমিকের ভরণপোষণের খরচ)। শ্রমশক্তি ক্রয়ের পর অর্থের মালিক তা ভোগ করার, অর্থাৎ সারাদিনের জন্যে, ধরা যাক, বারো ঘন্টার জন্যে তাকে খাটাবার অধিকার অর্জন করে। অথচ নিজের ভরণপোষণের খরচ তোলার মতো উৎপাদন শ্রমিক করছে ছয় ঘন্টার মধ্যেই ('প্রয়োজনীয়' শ্রমসময়) এবং বাকি ছয় ঘণ্টায় ('বাড়তি' শ্রমসময়) সে তৈরি করছে 'বাড়তি' উৎপাদন অথবা উদ্বৃত্ত মূল্য, যার জন্য পুঁজিপতি কোনও দাম দেয় না। অতএব উৎপাদনপ্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে পুঁজিকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে ঃ স্থায়ী পুঁজি, যা ব্যয় হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণসমূহের পেছনে (মেশিনপত্র, শ্রমের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি)—পুঁজির এই অংশের মূল্যের কোনও বদল না হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে (একসঙ্গে অথবা ভাগে ভাগে) উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে এসে জমা হয়। অন্য অংশটি হল পরিবর্তনশীল পুঁজি, যা ব্যয় হয় শ্রমশক্তির জন্য। শেষোক্ত পুঁজির মূল্য অপরিবর্তিত থাকে না, শ্রমপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা বেড়ে ওঠে এবং সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং, পুঁজি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা প্রকাশ করতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে পুরো পুঁজির তুলনা না করে তুলনা করতে হবে কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজির। এ হিসেবে, পূর্বোক্ত উদাহরণে এই অনুপাত, মার্কস যার নাম দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, হবে ৬:৬, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ।

পুঁজি সৃষ্টির ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হল, প্রথমত, সাধারণভাবে পণ্য-উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে কিছু ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, এমন শ্রমিকের অস্তিত্ব যে দুটি অর্থে 'মুক্ত' ঃ শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পথে সব রকমের বাধানিষেধ থেকে মুক্ত এবং জমি ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সব রকমের উপকরণ থেকেও মুক্ত। পিছুটানহীন স্বাধীন শ্রমজীবী একজন 'সর্বহারা', নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় ছাড়া যার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনও উপায় নেই।

উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে তোলার দুটি মূল পদ্ধতি আছে ঃ শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো ('পরম বা অ্যাবসোলিউট উদ্বৃত্ত মূল্য') এবং প্রয়োজনীয় শ্রমসময় কমানো ('আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য')। প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তুলে ধরেছেন একদিকে শ্রমদিনের সময় কমানোর জন্যে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামকে। পাশাপাশি তুলে ধরেছেন, চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রমসময় বাড়ানো এবং উনিশ শতকে ফ্যাক্টরি আইন অনুযায়ী শ্রমসময় কমানোর জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের এক বিপুল চিত্র। 'পুঁজি' বইখানি প্রকাশের পর বিশ্বের সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস হাজার হাজার নতুন তথ্য যুগিয়েছে এ চিত্রকে পূর্ণতা দিতে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস পুঁজিবাদে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তিনটি মূল ঐতিহাসিক পর্যায় আলোচনা করেছেন ঃ ১) সরল সহযোগিতা, ২) শ্রমবিভাগ ও হস্তশিল্প কারখানা (ম্যানুফ্যাকচার), ৩) মেশিনপত্র ও বৃহদাকার শিল্প। পুঁজিবাদী বিকাশের বুনিয়াদী ও বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলির কত গভীর বিশ্লেষণ মার্কস এখানে করেছেন তা বোঝা যায় রাশিয়ার 'কুটিরশিল্প' বলে যা পরিচিত তার অনুসন্ধান থেকে। এর মধ্য দিয়ে পুঁজিসৃষ্টির প্রথম দুটি পর্যায়ের বহু তথ্য সমৃদ্ধ উদাহরণ পাওয়া যায়। বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের যে বৈপ্লবিক প্রভাবের কথা মার্কস ১৮৬৭ সালে লিখেছিলেন, তা পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে একাধিক 'নতুন' দেশে (রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি) সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মার্কসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন অবদানটি হল কী ভাবে পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটি, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশ পুঁজিপতির ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খেয়ালখুশি মতো ব্যবহৃত না হয়ে কী ভাবে নতুন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তার বিশ্লেষণ উপস্থিত করা। পুঁজিতে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত মূল্যের পুরোটাই পরিবর্তনশীল পুঁজি সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয় বলে ধরে নিয়ে আগেকার সমস্ত চিরায়ত রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদরা (অ্যাডাম স্মিথকে দিয়ে যার শুরু) যে ভুল করেছিলেন, মার্কস তা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবে সেটা উৎপাদনের উপকরণ এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। (মোট পুঁজির ভেতরে) পরিবর্তনশীল পুঁজির অংশটার তুলনায় স্থায়ী পুঁজির অংশটার দ্রুততর বৃদ্ধি পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া এবং সমাজতন্ত্রে তার রূপান্তরের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শ্রমিকের বদলে যন্ত্র নিয়োগের গতিকে ত্বরান্বিত করে এবং সমাজের এক প্রান্তে বিপুল বৈভব এবং অন্য প্রান্তে চরম দারিদ্র সৃষ্টি করে পুঁজির সঞ্চয় বাড়িয়ে তোলে যাকে বলা যায়, 'শ্রমের মজুত বাহিনী', শ্রমিকের 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত' অথবা 'পুঁজিবাদী অতিরিক্ত জনসংখ্যা', যা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং পুঁজিকে চূড়ান্ত দ্রুত হারে উৎপাদনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ করে দেয়। এই ঘটনা এবং সেই সঙ্গে ঋণ পাওয়ার সুবিধা ও উৎপাদনের উপকরণরূপে পুঁজির যে সঞ্চয় তা থেকে অতি-উৎপাদনের সংকটকে বোঝার সূত্র পাওয়া যাবে। এই অতি-উৎপাদনজনিত সংকট পুঁজিবাদী দেশে প্রথমে দেখা দিত পর্যায়ক্রমে গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর, পরবর্তীকালে তা আসে আরও দীর্ঘ ও অনির্দিষ্ট ব্যবধানে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি সঞ্চয়ের বিষয়টিকে পুঁজির আদি সঞ্চয়ের থেকে আমাদের আলাদা করা উচিত। পুঁজি সঞ্চয়ের উৎস হল, উৎপাদনের উপকরণ থেকে জোর করে শ্রমজীবীদের বিচ্ছেদ ঘটানো, জমি থেকে চাষিকে বিতাড়ন, গ্রামসমাজের জমি আত্মসাৎ করা, উপনিবেশ স্থাপন ও গোটা জাতিকে ঋণগ্রস্ত করা, শুল্কের বেড়ায় সংরক্ষণ ইত্যাদি। 'প্রারম্ভিক সঞ্চয়' থেকে সমাজের এক প্রান্তে সৃষ্টি হয় 'মুক্ত' সর্বহারা এবং অন্য প্রান্তে অর্থের মালিক—পুঁজিপতি।

'পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা' সম্পর্কে মার্কসের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্লেষণটি হল, 'প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় নৃশংসতম বর্বরতায়, তীব্র রোষে হীন জঘন্যতম প্রবৃত্তির তাড়নায় চলে এই উচ্ছেদ। নিজের উপার্জনে সৃষ্ট ব্যক্তিসম্পত্তি (কৃষক ও হস্তশিল্পীদের) আলাদা আলাদা স্বাধীন শ্রমজীবীদের সঙ্গে তাদের শ্রমের হাতিয়ার ও উপকরণসমূহের বলা যায়, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছিল, তার স্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা অন্যদের নামেই-স্বাধীন শ্রমশক্তি শোষণের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে ... এখন যাদের উচ্ছেদ করতে হবে তারা স্বাধীনবৃত্তিধারী শ্রমজীবী নয়, আজ এসেছে বহু শ্রমিককে শোষণ করছে এমন পুঁজিবাদীদেরই উচ্ছেদ করার পালা। এই উচ্ছেদ সম্পন্ন হবে পুঁজিবাদী উৎপাদনেরই অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়ায়, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে। অনেক পুঁজিপতিকে খতম করে একজন পুঁজিপতি। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি কর্তৃক বহু পুঁজিপতিকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্রীভবন আরও বেশি বেশি হতে থাকে। এর ফলে বিকশিত হতে থাকে শ্রমপ্রক্রিয়ার সমবায়মূলক রূপ, সচেতনভাবে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ, ভূমির পরিকল্পিত সদ্ব্যবহার, শ্রমের উপকরণগুলির এমন রূপান্তর যাতে তা শুধু যৌথ-শ্রমপদ্ধতিতেই ব্যবহার করা সম্ভব। একইসাথে উৎপাদনের উপকরণগুলি যত বেশি সমষ্টিকৃত সামাজিক শ্রমের উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে, তত তা অধিক ফলদায়ী হয়ে ওঠে। বিশ্ববাজারের জালে সমস্ত জাতিকে জড়িয়ে ফেলা হয়, আর সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্র। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সবকিছু সুফল যারা দখল করে, একেচটিয়া ভাবে ভোগ করে, পুঁজির সেই সব রাঘব বোয়ালরা সংখ্যায় ক্রমাগত কমতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে জনগণের দুর্দশা, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন ও শোষণের ব্যাপকতা। কিন্তু তার সঙ্গেই বাড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহ। যে শ্রেণি ক্রমাগত বেড়ে চলে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার কল্যাণেই তারা শিক্ষিত ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে ওঠে। পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা যা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনেই গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়, তা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পায়ের শৃঙ্খলে পরিণত হয়। উৎপাদনের উপকরণের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ এমন একটা মাত্রায় গিয়ে পৌঁছয় যখন তার সঙ্গে আর পুঁজিবাদী সমাজের আধারটা খাপ খায় না। আধারটা ফেটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বাজে। অবশেষে উচ্ছেদ করা হয় উচ্ছেদকারীদের' (পুঁজি', খণ্ড ১) (৩৫)।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব হল মোট সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন বিষয়ে পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত মার্কসের বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রেও মার্কস একক ঘটনা ধরে বিচার না করে বিস্তৃত ঘটনা ধরে

চারের পাতায় দেখুন

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

তিনের পাতার পর

বিচার করেছেন। সমাজের অর্থনীতির একটা ভগ্নাংশকে ধরে নয়, সমগ্রভাবে পুরো অর্থনীতির ভিত্তিতে বিচার করেছেন। চিরায়ত অর্থনীতিবিদদের পূর্বোক্ত ভ্রান্তি সংশোধন করে মার্কস সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে ভাগ করেছেন দুটি বৃহৎ ভাগে ঃ ১) উৎপাদনের উপকরণসমূহের উৎপাদন ২) ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন, এবং পূর্ব পরিমাণে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয়— এই দুটি ক্ষেত্রে সমস্ত সামাজিক পুঁজির মোট সঞ্চালন বিষয়ে সংখ্যাগত দৃষ্টান্ত তুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মূল্যের নিয়মকে ভিত্তি করে কীভাবে মুনাফার গড় হার সৃষ্টি হয়— সেই সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে 'পুঁজি' বইটির তৃতীয় খণ্ডে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস যে বৃহৎ অগ্রগতি ঘটিয়েছেন সেটা হল এই যে, প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অথবা সাম্প্রতিক প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব' (থিওরি অফ মার্জিনাল ইউটিলিটি) (৩৬) যেভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা প্রতিযোগিতার বাহ্যিক অগভীর দিকগুলিতেই মূলত সীমাবদ্ধ থাকে, মার্কস সে রকম কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে বিশ্লেষণ করেছেন ব্যাপক অর্থনৈতিক ঘটনাবলি বিচারের ভিত্তিতে সামাজিক অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করার দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতিতে এই হল মার্কসের সুনির্দিষ্ট অবদান। মার্কস প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন কী ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়, এবং তারপরে পর্যালোচনা করেছেন তা কী ভাবে মুনাফা, সুদ ও ভূমি-খাজনায় ভাগ হয়ে যায়। মুনাফা হল কারবারে ঢালা মোট পুঁজির তুলনায় বাড়তি মূল্যের অনুপাত। যে পুঁজির 'আঙ্গিক বহর বড়' (হাই অর্গানিক কম্পোজিশন) (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থায়ী পুঁজির পরিমাণ যেখানে সামাজিক গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে বেশি) তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে কম। যে পুঁজির 'আঙ্গিক বহর ছোট' তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি। পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্বাধীনভাবে পুঁজির চলাচলের ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফার হার গড় হারের আশেপাশে হয়। কোনও একটি সমাজে সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য সমস্ত পণ্যের মোট দামের সমান হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারবারে এবং উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রতিযোগিতার দরুন পণ্য তার যথাযথ মূল্যে বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হয় উৎপাদনের দাম (অথবা উৎপাদন-দাম) অনুসারে, যা ব্যয়িত পুঁজির সঙ্গে গড় মুনাফার যোগফল।

এইভাবে মার্কস মূল্য ও দামের পার্থক্য এবং মুনাফার সমতার সুবিদিত ও তর্কাতীত ঘটনাটিকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মূল্যের নিয়মকে ভিত্তি করে। তিনি দেখিয়েছেন, সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য তার মোট দামের সঙ্গে সমান। কিন্তু মূল্যের (যা সামাজিক) সঙ্গে দামের (যা বিশেষ) সমীকরণ অবশ্য সরলভাবে ও সোজাসুজি হয় না, হয় অতি জটিল এক পদ্ধতিতে। যে সমাজে আলাদা আলাদা পণ্যোৎপাদকদের মধ্যে কেবলমাত্র বাজারের মারফতই মিলন সম্ভব, সেখানে খুবই স্বাভাবিক যে, সামাজিক নিয়মবদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্য সম্ভব গড়পড়তা ভাবে। সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কিছু হেরফের থাকলেও তা পরস্পর পরিপূরক হয়ে যায়।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অর্থ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থায়ী পুঁজির দ্রুততর বৃদ্ধি। উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজি থেকে, তাই এ কথা খুবই পরিষ্কার যে, মুনাফার হার (শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে নয়, সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত) এই অবস্থায় ক্রমশ কমে যাবার ঝোঁক দেখায়। এই ঝোঁক এবং যে কারণে এই ঝোঁকটা আড়ালে থাকে অথবা তা বাধা পায়, এ নিয়ে মার্কস বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। পুঁজির তৃতীয় খণ্ডে সুদখোর পুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি ও অর্থ হিসাবে পুঁজি বিষয়ে অসাধারণ চিত্তাকর্ষক যেসব অধ্যায় আছে তার বিবরণ দেওয়ার জন্য না থেমে এবার সবচেয়ে প্রধান বিষয়— ভূমি-খাজনার তত্ত্বে চলে আসা যাক। যেহেতু ভূমিক্ষেত্রের পরিমাণ সীমিত এবং পুঁজিবাদী দেশে তা পুরোপুরি আলাদা আলাদা মালিকের অধিকারে থাকে, সে জন্য কৃষিপণ্যের দাম তার উৎপাদন-খরচ দিয়ে স্থির হয় এবং তা হয় সর্বনিকৃষ্ট মানের জমিতে উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতে, গড়পড়তা সাধারণ মানের জমিতে উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতে নয়। একই ভাবে উৎপন্ন সামগ্রী বাজারজাত করতে সবচেয়ে খারাপ যে ব্যবস্থা উৎপাদন খরচের সাথে যুক্ত হয় সেটাই, গড়পড়তা সাধারণ যে সরবরাহ ব্যবস্থা তার খরচের ভিত্তিতে কৃষিতে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম নির্ধারণ হয় না। এই ভাবে নির্ধারিত ফসলের দামের সঙ্গে উন্নততর জমিতে (কিংবা উন্নততর অবস্থায়) উৎপাদনের দামের তফাতই গড়ে দেয় খাজনার পার্থক্য (ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট)। এই বিষয়টা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন, ভূমিখণ্ডের উর্বরতার পার্থক্য ও তাতে যে পরিমাণ পুঁজি ঢালা হয়েছে তার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে ভূমির খাজনার পার্থক্য তৈরি হয়। মার্কস এই বিষয়টির সবিস্তার বিশ্লেষণ উপস্থিত করে এ বিষয়ে রিকার্ডোর ভ্রান্তি— উৎপাদককে ক্রমান্বয়ে ভাল জমি থেকে একেবারে খারাপ জমিতে সরে যেতে হলেই একমাত্র ভূমি-খাজনার পার্থক্য ঘটে— তার নিরসন করলেন ('উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য, তাতে রডবের্টুসকে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা বিশেষ করে লক্ষণীয়)। যদিও এর বিপরীত ধরনের পরিবর্তনও ঘটে, এক ধরনের জমি রূপান্তরিত হয় অন্য ধরনের জমিতে (কৃষি যন্ত্রপাতির অগ্রগতি, শহরের বিস্তার ইত্যাদি কারণে)। মার্কস আরও দেখালেন 'ভূমির ক্রমহ্রাসমান উর্বরতার' কুখ্যাত 'নিয়মটি' চরম ভুল, এর মাধ্যমে পুঁজিবাদের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা, দ্বন্দ্বের দায় চাপানো হয়েছে প্রকৃতির ঘাড়ে। অধিকন্তু, শিল্পের এবং সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় মুনাফার সমতাসাধনের কথা বললে ধরে নিতে হয় প্রতিযোগিতার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির অবাধ চলাচল ঘটছে। অথচ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা একচেটিয়া অধিকার গড়ে তোলে এবং তাতে এই অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হল তার পুঁজির আঙ্গিক বহর ছোট, সুতরাং ব্যক্তিগত মুনাফার হার উচ্চতর। কিন্তু এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে কৃষিদ্রব্য মুনাফার হারের সমতাসাধনের পরিপূর্ণ স্বাধীন প্রক্রিয়াটির অন্তর্ভুক্ত হয় না। জমির মালিক একচেটিয়া-অধিকারী হিসেবে গড়পড়তার চেয়ে বেশি দাম ধরার সুযোগ পায় আর এই একচেটিয়া দাম থেকেই জন্ম নেয় শর্তহীন খাজনা (অ্যাবসোলিউট রেন্ট)। পুঁজিবাদের আওতায় পার্থক্যযুক্ত খাজনার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। কিন্তু শর্তহীন খাজনার অবসান সম্ভব— যেমন, জমির জাতীয়করণ হলে, রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে তার রূপান্তর ঘটলে। এইরকম রূপান্তরের অর্থ হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকের একচেটিয়া অধিকার বিলোপ এবং কৃষির ক্ষেত্রে অধিকতর সুসঙ্গত ও পূর্ণতর স্বাধীন প্রতিযোগিতার প্রবর্তন। সেই জন্যেই মার্কস বলেছেন, ইতিহাসে র‍্যাডিকাল বুর্জোয়ারা জমি জাতীয়করণের এই প্রগতিশীল বুর্জোয়া দাবিটিকে একাধিক বার উত্থাপন করেছে, কিন্তু অধিকাংশ বুর্জোয়াই তাতে ভয় পায়, কেন না তাতে 'বেশ জোরে ধাক্কা লাগে' আর এক ধরনের একচেটিয়া অধিকারে, যা আমাদের কালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও 'স্পর্শকাতর' আর এক ধরনের একচেটিয়া অধিকার— সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর একচেটিয়া অধিকার। (১৮৬২ সালের ২ আগস্ট এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি পত্রে মার্কস পুঁজির ওপর মুনাফার গড় হার এবং শর্তনিরপেক্ষ ভূমি-খাজনা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বকে আশ্চর্য জনবোধ্য, সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার করে পেশ করেছিলেন (পত্রাবলি, খণ্ড ৩ দ্রষ্টব্য, ১৮৬২ সালের ৯ আগস্টের পত্রটিও তুলনীয়, ঐ)।

ভূমি-খাজনার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্কসের বিশ্লেষণ উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস দেখিয়েছেন, কী করে শ্রম-খাজনা (চাষি যখন জমিদারের জমিতে নিজের মেহনতে বাড়তি উৎপন্ন সৃষ্টি করছে) রূপান্তরিত হচ্ছে ফসল বা সামগ্রী হিসেবে প্রদত্ত খাজনায় (চাষি যখন তার নিজের জমিতে বাড়তি উৎপন্ন তৈরি করছে এবং জমিদারকে দিচ্ছে 'অর্থনীতিবহির্ভূত বাধ্যতার' জন্যে), তারপর মুদ্রা-খাজনায় (পণ্য-উৎপাদনের বিকাশের ফলে মুদ্রায় পরিণত ফসলি খাজনা যেমন, সেকেলে রাশিয়ার 'অব্রক'— *স্বাধীন চাষি বা জমি ব্যবহারকারীরা কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে যে খাজনা দেন ঃ গণদাবী*) এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী খাজনায়, যখন চাষির বদলে আসছে কৃষি-ব্যবসায়ী যে চাষ করায় মজুরি-শ্রমের সাহায্যে। 'পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভবের' এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিবর্তন সম্পর্কে মার্কসের কয়েকটি সুগভীর (এবং রাশিয়ার মতো পশ্চাদ্বর্তী দেশগুলির পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ) ধারণা উল্লেখযোগ্য। 'ফসলি খাজনা যখন মুদ্রা-খাজনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার আবশ্যিক সঙ্গী হিসাবে শুধু নয়, এমনকি আগে থেকেই সৃষ্টি হয় সম্পত্তিহীন দিনমজুরের একটি শ্রেণি, যারা মজুরি নিয়ে খাটে। এই শ্রেণিটির উদ্ভবের পর্বে, যখন তারা সবে দেখা দিচ্ছে এখানে-ওখানে, তখন স্বভাবতই অবস্থাপন্ন মুদ্রা-খাজনাদায়ী কৃষকদের মধ্যে নিজেদের কাজে খেতমজুরদের শোষণ করার একটা রীতি বেড়ে উঠতে থাকে, ঠিক যেভাবে সামন্ত যুগে অবস্থাপন্ন ভূমিদাস চাষিরা নিজেরাও আবার ভূমিদাস রাখত। এই সব চাষিদের পক্ষে ক্রমে ক্রমে হাতে কিছু সম্পদ জমিয়ে ভবিষ্যৎ পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। নিজের জমিতেই স্বনিযুক্ত পুরনো জমি-মালিকদের মধ্য থেকেই এইভাবে গড়ে ওঠে পুঁজিপতি ইজারাদারীর পাঠশালা, যাদের বিকাশ নির্ভর করছে গ্রামাঞ্চলের গণ্ডি ছাড়িয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ বিকাশের ওপর' (পুঁজি, খণ্ড ৩) (৩৭) ... 'গ্রামবাসীদের একাংশের উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে তাদের বিতাড়ন তাদের জীবনধারণের উপকরণ ও শ্রমের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে শিল্পপুঁজির প্রয়োজনে তাদের মুক্ত করে দিল। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল অভ্যন্তরীণ বাজার।' (পুঁজি, খণ্ড ১) (৩৮)। কৃষিজীবী জনগণের দারিদ্র্যবৃদ্ধি ও ধ্বংস আবার পুঁজির জন্যে শ্রমের মজুত বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয়। যে-কোনও পুঁজিবাদী দেশেই 'তাই কৃষিজীবী জনগণের একাংশ অনবরত শহরের বা হস্তশিল্প কারখানার (অর্থাৎ কৃষিজীবী নয়) সর্বহারায় পরিণত হতে থাকে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতার এই ধারা অবিরাম বয়ে চলে ... গ্রাম্য মেহনতিকে নেমে আসতে হয় সর্বনিম্ন মাত্রার মজুরিতে, এক পা তার সবসময়েই ডুবে থাকে দুর্দশার পাঁকে' (পুঁজি', খণ্ড ১) (৩৯)। কৃষক যে জমি চাষ করছে তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা হল ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের ভিত্তি, এটাই তার বিকাশ ও সর্বোন্নত রূপ গ্রহণের শর্ত। কিন্তু এ ধরনের ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন খাপ খায় শুধু একটা অপরিসর আদিম ধাঁচের উৎপাদন ও সমাজের সঙ্গে। পুঁজিবাদের আওতায় কৃষকদের শোষণ শুধু রূপের দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের শোষণ থেকে ভিন্ন ধরনের। উভয়ের শোষক একই— পুঁজি। আলাদা আলাদা পুঁজিপতি শোষণ করে আলাদা আলাদা কৃষককে বন্ধকী ও সুদের কারবার মারফত। সামগ্রিকভাবে পুঁজিপতি শ্রেণি কৃষক শ্রেণিকে শোষণ করে রাষ্ট্রীয় কর মারফত ('ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম') (৪০)। 'কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন সম্পত্তি পুঁজিপতিদের কাছে জমি থেকে মুনাফা, সুদ ও খাজনা আদায়ের সুযোগ নিয়ে আসে। আর নিজের পারিশ্রমিকটুকু কোনওমতে অর্জনের ভার তারা চাপিয়ে দেয় ভূমির মালিকেরই ওপর' ('আঠারোই ব্রুমেয়ার') (৪১)। এটাই নিয়মে দাঁড়ায় যে, চাষি এমনকি তার নিজের পারিশ্রমিকের একাংশ পর্যন্ত দিয়ে দেয় পুঁজিবাদী সমাজের অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণির জন্যে এবং তাকে নিজেকে নেমে যেতে হয় 'আইরিশ ঠিকাচাষির সমপর্যায়ে, অথচ ভাবখানা থাকে, যেন সে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিক' ('ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম') (৪২)। 'যে সব দেশে চাষ হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে, তাদের তুলনায় ক্ষুদ্রাকার চাষবাসের আধিক্য যে সব দেশে সেখানে খাদ্যশস্যের দাম কম, তার অন্যতম কারণ কী? (পুঁজি', খণ্ড ৩) (৪৩)। কারণ, কৃষক তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ বিনামূল্যে সমাজের হাতে (অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে) ছেড়ে দেয়। সুতরাং, (খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের) এই নিচু দাম হল উৎপাদকদের দারিদ্রের পরিণাম, কোনও মতেই তাদের শ্রম-উৎপাদনশীলতার ফল

পাঁচের পাতায় দেখুন

আশাকর্মীদের মাসিক ভাতা ৮ কিস্তিতে

শ্রমিক শোষণের নয়া ছক

রাজ্যের ৫৪ হাজার আশাকর্মী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন বঞ্চনা কাকে বলে। দীর্ঘ করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে এই রাজ্যের সমস্ত আশাকর্মী জীবন বাজি রেখে কোভিড মোকাবিলা, পোলিও প্রতিরোধ, কোভিড ভ্যাকসিন, দুয়ারে সরকার সহ শিশু ও মাতৃ মৃত্যুরোধে ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারের দেওয়া দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কিন্তু সরকার তাদের কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয় না, দেয় না শ্রমের মূল্য। রুটিন মাফিক কাজের বাইরে জোরপূর্বক বাড়তি কাজের বোঝা একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা অমানবিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

করোনার তৃতীয় ঢেউ এসে গেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তার মোকাবিলা করতে আশাকর্মীদের আবার কাজে নামানো হচ্ছে। কিন্তু সরকার এখনও আশাকর্মীদের ৭-৮ মাসের বকেয়া ইনসেনটিভ পুরোটা দেয়নি। ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা করে অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে। কখন কোন মাসের কীসের টাকা অ্যাকউন্টে দিচ্ছে বোঝার উপয় নেই।

এরপরে আবার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আশাকর্মীদের ইনসেনটিভের টাকা ৮টি কিস্তিতে ভাগ করে দেওয়া হবে। কেন? কোন সরকারি কর্মীর বেতন ৮ কিস্তিতে দেওয়া হয়? মন্ত্রী-বিধায়কদের ভাতা কি ৮ ভাগে দেওয়া হয়? এ কি টাকা আত্মসাতের ছল নয়? ক্ষোভে ফুঁসছে আশাকর্মীরা। কর্মী ইউনিয়নের নেত্রী ইসমত আরা খাতুন বলেন, কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেও কাজের পারিশ্রমিক থেকে আজও তারা বঞ্চিত। কোভিড আক্রান্ত আশাকর্মীরা আবেদন করা সত্ত্বেও বিমার ১ লক্ষ টাকা এখনও সরকার দেয়নি। বিভিন্ন মহল থেকে আশাদের কাজের প্রশংসা হলেও তারা কিছু সমস্যা ও দাবি জানাতে গেলে সরকার তাদের নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখায়। সরকার আশাকর্মীদের সাথে দাস শ্রমিকের মতো আচরণ করছে।

৭ জানুয়ারি হাওড়া সিএমওএইচ-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যভবনে মিশন ডিরেক্টরের কাছে তারা স্মারকলিপি পাঠিয়েছে। তাদের দাবি, আশাকর্মীদের মাসিক উৎসাহ ভাতা ৮টি হেডে বিভক্ত করা চলবে না, বিভিন্ন জেলায় ৬-৭ মাসের বকেয়া ইনসেনটিভ অবিলম্বে দিতে হবে, কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে একটার পর একটা কাজ

চাপানো চলবে না, অবিলম্বে ফিক্সড অনারারিয়াম বৃদ্ধি করতে হবে, ফরম্যাটের প্রতি আইটেমে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং সমস্ত টাকা নিঃশর্তে দিতে হবে, ফরম্যাট প্রক্রিয়া বাতিল করে ফিক্সড বেতন চালু করতে হবে।

দার্শনিক কার্ল মার্কস

চারের পাতার পর

নয়' ('পুঁজি', খণ্ড৩)(৪৪)। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ হল ক্ষুদ্র ভূমি-মালিকানা, পুঁজিবাদের আওতায় তা অধঃপতিত, বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়। 'ক্ষুদ্র ভূমি-মালিকানার প্রকৃতিটাই এমন যে তাতে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশ, শ্রমের সামাজিক রূপ, পুঁজির সামাজিক পুঞ্জীভবন, বৃহদাকারে পশুপালন এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ অসম্ভব। সুদের কারবার ও করব্যবস্থার ফলে সর্বত্রই তার নিঃস্ব হয়ে যাওয়াটা অনিবার্য। জমি কেনার জন্যে যে পুঁজি ব্যয় হয় তা চাষের কাজ থেকে বাদ পড়ে। উৎপাদনের উপকরণ বহু খণ্ডে বিভক্ত হলে খোদ উৎপাদকরাই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।' (সমবায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র চাষিদের সমিতিগুলি অসাধারণ প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভূমিকা পালন করলেও তাতে করে এ ঝোঁকটা দুর্বল হয় মাত্র, তার অবসান ঘটে না, এ কথাও ভুললে চলবে না যে, অবস্থাপন্ন কৃষকদের জন্যে সমবায় অনেক কিছু করলেও গরিব চাষিদের ব্যাপক অংশের জন্য প্রায় কিছুই করে না। পরে সমিতিগুলি নিজেরাই মজুরি-শ্রমের শোষক হয়ে বসে)। 'মনুষ্যশক্তির বিপুল অপচয়। টুকরো টুকরো (ক্ষুদ্র) ভূমি-মালিকানার নিয়মই হল উৎপাদনের অবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতি এবং উৎপাদনের উপকরণের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি' (৪৫)। যেমন শিল্পে, তেমনি কৃষিতেও পুঁজিবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটায় শুধু উৎপাদককে শহিদ বানিয়ে। 'অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে থাকার দরুন গ্রাম্য শ্রমিকদের প্রতিরোধক্ষমতা ভেঙে পড়ে, অন্য দিকে একত্রে থাকার ফলে শহুরে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শহরের কারখানার মতোই আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থাতেও শ্রমের পরিমাণ ও উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া গতিলাভ করে শ্রমশক্তিকেই ছিবড়ে করে তাকে জীর্ণ করে দেওয়ার বিনিময়ে। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী কৃষির সমস্ত অগ্রগতির কৌশল হল শুধু শ্রমিককে নয়, ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের অগ্রগতি...সুতরাং, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায় এবং উৎপাদনের বহুমুখী প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক করে তোলে। করে এমনভাবে যাতে একইসঙ্গে সব সম্পদের মূল দুটি আধার—ভূমি ও শ্রমিকের সব রস শুষে নেয়।' (পুঁজি', খণ্ড ১, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ)।

(চলবে)

কমসোমলের রাজ্য শিক্ষা শিবির

৩১-ডিসেম্বর-১ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদায় অনুষ্ঠিত হল এসইউসিআই(সি)-র কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষাশিবির। ৩১ ডিসেম্বর বিকেলে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা করেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত ও কমরেড অনুরূপা দাস। নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে কমসোমল সদস্যরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারের অডিটোরিয়াম হলে, ২০টি জেলার ২১৯ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কমসোমলের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি?' এবং 'কিশোরদের প্রতি' বই দুটি থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের ওপর শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ৫৩ জন আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিন, শিবিরে যোগ দেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল এবং এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। দু'দিনই আলোচনার মাঝে মাঝে নানা জেলার প্রতিনিধিরা আবৃত্তি, গান পরিবেশন করে।

খুবই উল্লেখযোগ্য যে, প্রবীণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমরেড চন্দ্রনাথ মহাপাত্র, কিশোর কিশোরীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য দ্বিতীয় দিন শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত হন। এ বছরই মার্চ মাসে তিনি শতবর্ষে পদার্পণ করবেন। জীবনের প্রারম্ভে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সিপিআই-এর সাথে যুক্ত হন। ৮৮ বছর বয়সে কমরেড শিবদাস ঘোষের বই পাঠ করে ও পার্টির কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে তিনি বুঝতে পারেন মার্কসবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় গড়ে ওঠা এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-ই এ দেশের বুকে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি। তারাই পারে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব সংগঠিত ও সফল করতে। এই উপলব্ধি থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে ও পথেই জীবনকে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন চন্দ্রনাথ বাবু।

প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে বলেন 'আমার যাত্রা শেষ, তোমাদের যাত্রা শুরু। উন্নত মহান জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার জন্য তোমাদের লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে। কমসোমলের পক্ষ থেকে তাঁকে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি সম্বলিত স্মারক ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে, কমরেড সৌমেন বসু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকেই একটা সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে সকল মানুষের সত্যিকারের মর্যাদা ও বাঁচার সুযোগ থাকবে। আর কৈশোর হল সেই স্বপ্ন নিয়ে নিজেদের যথার্থভাবে গড়ে তোলার সব থেকে উপযুক্ত বয়স। সেভাবে তোমাদেরও গড়ে উঠতে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয় ও ইতিহাসের গতিপথে সমাজ পরিবর্তনের স্তরগুলিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। দেশ-বিদেশের মহান মনীষী, মুক্তি সংগ্রামের যোদ্ধাদের জীবন থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। যে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলে তৈরি জিনিস ভোগ করে আমরা বেঁচে আছি। তাদের ও নিজেদের উপরে চাপানো শোষণের সমস্ত শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে হবে। তাই অসহায় মানুষের প্রতি গভীর হৃদয়বৃত্তি গড়ে তুলতে পারলেই আমরা তাদের ঋণ শোধ করতে পারবো। সেজন্য, সমস্ত বিষয়কে বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে, কৈশোর থেকেই সমাজ পরিবর্তনের সৈনিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, মানুষকে শুধু তার দোষ দিয়ে নয়, দোষ তার গুণের মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে। কমসোমলের সদস্যদের অপরের গুণ থেকেই শিখতে হবে। তিনি বলেন, কৈশোরের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে পুঁজিবাদ ধ্বংস করার বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করছে প্রতি মুহূর্তে। মানুষ যাতে বিবেকের ডাকে সাড়া না-দেয়, তাই আচার-ব্যবহার-জীবনবোধ সব দিক থেকেই মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন করছে তারা। এর বিরুদ্ধে চাই উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে জীবন পরিচালনার সুশৃঙ্খল সংগ্রাম। আজকে সেই সংগ্রামে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য চিন্তাধারা।

শিবিরে কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরীকে ইনচার্জ করে কমসামলের ৪১ জনের নতুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

চণ্ডীগড়ে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি গোয়েঙ্কাকে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ

কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীকে বেচে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা রমেশ পরাশর ১০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত এই বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এর উৎপাদন, বন্টন ইত্যাদিজনিত ক্ষতি (এটিসি লস) মাত্র ৯ শতাংশের কাছাকাছি, যা শুধু ভারতে নয় বিশ্বেও একটি মডেল। তাহলে একে বেসরকারিকরণ কী উদ্দেশ্যে?

প্রতিবাদ উঠেছে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, ১৯৯০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার সিইএসসি-কে ৮ কোটি টাকায় আর পি গোয়েঙ্কাকে বেচে দিয়েছিল। তার ফল কী? কলকাতায় বিদ্যুতের দাম সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং পরিষেবা সবচেয়ে খারাপ। যার বিরুদ্ধে গ্রাহকরা আন্দোলন করছেন ধারাবাহিকভাবে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারিকরণের এই যে পদক্ষেপ বিজেপি সরকার নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয় সংগঠন দু'টির পক্ষ থেকে।

বিচ্ছিন্নবাসের সময় কমানোর বিরোধিতা সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ১২ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, করোনা অতিমারির তৃতীয় ঢেউ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যে সহস্রাধিক ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। যার ফলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হাসপাতালের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পরিষেবা আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তারদের-স্বাস্থ্যকর্মীদেরই যে কোনও রোগের ক্ষেত্রে প্রথমেই রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই তাদের মধ্যেই সংক্রমণের হার বেড়ে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্নবাসের সময় কমানো হচ্ছে। তৃতীয় ঢেউয়ে কারা ওমিক্রনে আক্রান্ত, কারা ডেল্টা প্লাসে, তা খুব কম ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা হচ্ছে। ফলে বেশিরভাগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ হচ্ছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। আর নতুন ভ্যারিয়েন্টের আক্রান্ত হওয়ার ঠিক পরে পরেই বা কিছুদিন পরে কী ধরনের জটিলতা হতে পারে তাও চিকিৎসা মহলে অজানা। এই অবস্থায় ডাক্তারদের সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই অবৈজ্ঞানিকভাবে আইসোলেশন পিরিয়ড কমিয়ে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে। বহু চিকিৎসক এতে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারেন। আমরা সরকারের এই অবৈজ্ঞানিক, অবিবেচক এবং অমানবিক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে করোনা আক্রান্ত চিকিৎসকদের পুনরায় কাজে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে নির্ধারণ করার দাবি জানাচ্ছি।

আরও উদ্বেগের বিষয় হল, বর্তমানে বিপুল ঘাটতি পরিকাঠামো এবং ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের যে ভয়ঙ্কর ঘাটতি রয়েছে এবং অনেকে করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়ায় এই ঘাটতি আরও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, তাতে রোগী পরিষেবা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এই কথা মাথায় রেখে কোনও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত এবং সম্মানজনক পারিশ্রমিক দিয়ে ডাক্তার নার্স

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নতুন সদস্য

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ক্রমে দলের রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলেন যাঁরা ঃ

১) কমরেড অনীশ কুমার রায়, ২) কমরেড সুদীপ্ত দাশগুপ্ত (কাঞ্চন দাশগুপ্ত), ৩) কমরেড বিমল জানা, ৪) কমরেড অনুকূল ভদ্র, ৫) কমরেড অসিত বরণ দে, ৬) কমরেড সুজিত ঘোষ, ৭) কমরেড অসিত মণ্ডল, ৮) কমরেড মৃদুল সরকার, ৯) কমরেড অংশুমান মিত্র, ১০) কমরেড সুব্রত বিশ্বাস।

প্রকাশিত হল

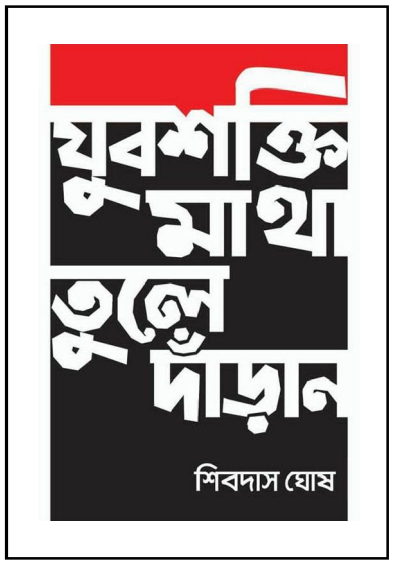

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলার প্রবীণ সংগঠক অধ্যাপক কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত ১০ জানুয়ারি রাত দশটায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি হার্টের সমস্যা সহ অন্যান্য অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ওই দিন সন্ধ্যায় ঘরে থেকেই একটি অনলাইন আলোচনা সভায় তিনি অংশ নেন। সভা চলাকালীন অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর পথেই তিনি মারা যান। খবর পেয়েই দলের কর্মীরা বাগুইহাটি কেষ্টপুরে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষ থেকে কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত-র সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যার্পণ করা হয়। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সহ অন্যান্য কমরেডরাও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেহালায় থাকাকালীন তাঁর বোন ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন। সেই সুবাদে তাঁদের বাড়িতে দলের নেতা-কর্মীদের যাওয়া আসা ও আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শের সাথে পরিচিত হন। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর দমদমের একটি স্কুলে শিক্ষকতার সূত্রে তিনি দমদমে আসেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজে পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন। ওই সময় থেকেই তিনি কেষ্টপুর এলাকায় দলের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং প্রথমে তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস ও পরে সিপিএমের সন্ত্রাস ও আক্রমণের মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে এলাকায় সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এলাকায় বেশ কিছু কর্মী ও বহু সমর্থককে যুক্ত করেন।

এলাকার উন্নয়নকল্পে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষ ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই নাগরিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এলাকার উন্নয়নের অনেক দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিক ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন, পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সহ দল পরিচালিত সমস্ত গণআন্দোলনেই তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৯০-এ শারদোৎসবের সময় বাগুইআটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেশ কয়েকদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। তার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত নাগরিকদের উপর পুলিশের গুলি চালনায় দোষী পুলিশের শাস্তির দাবি জানায় এলাকার জনগণ। সরকার কর্ণপাত না করায় কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত এলাকার আরও কিছু নাগরিকদের সাথে বেসরকারি তদন্ত কমিশন (শর্মা সরকার কমিশন) গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এলাকার শত শত মানুষের সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতে কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দোষী পুলিশের শাস্তির সুপারিশ করে—যে ঘটনা এখনও এলাকার মানুষ স্মরণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দলের অধ্যাপক সংগঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অধ্যাপক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। কোথাও কোনও অধ্যাপক সমস্যায় পড়েছেন জানলে তিনি গিয়ে পাশে দাঁড়াতেন। কলেজে কলেজে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তার জন্য তিনি রাজ্যস্তরের সর্বদলীয় অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুটার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত ছিলেন আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ। তিনি দলের সাথে নিজের মা সহ সকল ভাই-বোনকে যুক্ত করেছিলেন। এলাকার মানুষের সাথে তাঁর আন্তরিক এবং ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। দলের জুনিয়র কর্মীদের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। এক্ষেত্রে তাঁর মা প্রয়াত কমরেড বীণাপাণি দাশগুপ্তর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁদের পরিবার ছিল পার্টি পরিবার। দলের একজন কর্মী দীর্ঘ বছর ধরে তাদের পরিবারের সদস্য হিসাবেই অত্যন্ত যত্ন ও ভালোবাসা পেয়ে তাঁর বাড়িতে থেকে দলের কাজ করেছেন। কমরেড প্রণব দাশগুপ্তের আগ্রহেই তাঁর বাড়ির একটা অংশ দলের আঞ্চলিক অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শেষ দিকে বয়সের ভার ও নানা রোগে জর্জরিত থাকায় বেশি চলাফেরা করতে পারতেন না। এলাকার কর্মীরা তাঁর কাছে আসতেন। তিনি ছিলেন তাদের অভিভাবক। কমরেড প্রণব দাশগুপ্তর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ তাদের সুখ-দুঃখের সাথীকে হারালো। দল হারালো একজন উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী সংগঠককে।

কমরেড প্রণব দাশগুপ্ত লাল সেলাম

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল, পরিবহণে ছাত্র কনসেশন, স্কুল-কলেজ খোলা প্রভৃতি দাবিতে, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে ১১ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়র জেলা ছাত্র সম্মেলন হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড সুনীল গোপাল এবং এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মুদিত ভাটনগর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পাঠকের মতামত

শুধু স্কুল-কলেজই বন্ধ!

দীর্ঘ প্রায় দু'বছর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কিছু রাজ্য ইতিমধ্যে বিধি-নিষেধ জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে আপাতত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘ লকডাউনের পর যখন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলে তখন দেখা গেল বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কাই সত্যি হল। ড্রপ আউটের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে, পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়েছে বহু ছাত্রছাত্রী, বাইরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যুক্ত হয়েছে অনেক অভাবী ঘরের ছাত্ররা, আবার অনেক অভিভাবক কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিয়েছেন অভাবের তাড়নায়। ফলে পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অনেক ছাত্রছাত্রী। ২০১৯-২০ সালে মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা বেশি। সম্প্রতি ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিকট ইনফর্মেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাসের রিপোর্টে উঠে এসেছে গত শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশেরও বেশি। রিপোর্টে আরও একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে, দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ ছাত্র মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়তে যায় না।

তাই লকডাউনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্কুলগুলো খুললেও ছাত্রছাত্রীর অভাবে বহু স্কুল ধুঁকছে। পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর অভাবে বহু স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। শিক্ষা একটা জাতির মেরুদণ্ড। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই শিক্ষাকে ব্যবসায়ী কর্পোরেট হাউসের হাতে তুলে দিতে চাইছে। তাই করোনা আবহে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই বন্ধ করে দিয়েছে। করোনার জন্য দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে, অথচ মিটিং-মিছিল নির্বাচন, সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, শিল্প-কারখানা সমস্ত কিছুই খোলা। রেস্তোঁরা, শপিংমল, বাজার, হাট সব খোলা। এমনকি খোলা রয়েছে পানশালাও। ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা হল, থিয়েটার হল খোলা। গঙ্গাসাগর মেলা হচ্ছে, ভোট হচ্ছে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাবে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে ও পৌরভোট ঘোষিত হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে যদি নির্বাচন হতে পারে, মেলা হতে পারে তা হলে পরিকল্পনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা যেতে পারে না কি?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে সরকারের গোড়া থেকেই কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ কার্যকর করার এক গভীর চক্রান্ত নিহিত রয়েছে। দীর্ঘ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অনলাইন শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। শিক্ষাকে মুনাফা লাভের বহুমূল্য পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকে 'গ্যাটস চুক্তির' মধ্য দিয়েই শিক্ষাকে শুধু বাণিজ্যিক পণ্যেতে পরিণত করে দেশি-বিদেশি মালিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

করোনার প্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। শিশুদের শিক্ষার কাল বিলম্বিত হচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারের কোনও নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনা নেই। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে যে সমস্ত রায় হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে সব জেনে বুঝে এরা চোখ বুজে আছেন। শর্তসাপেক্ষে মেলা করার অনুমতি দিচ্ছে হাইকোর্ট কিন্তু স্কুল খোলা হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিলের চাল নিতে এলে করোনা ছড়াচ্ছে না, ভর্তি হতে গেলে করোনা ছড়াচ্ছে না, কিন্তু স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা নিতে গেলে করোনা হবে। এই ধারণার পেছনে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে কি?

শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যেত। রোটেশন ভিত্তিতে শিক্ষকদের দিয়ে স্কুল পরিচালনা করানো যেত। করোনা অতিমারিতে যখন জনগণের জীবনকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্যই ভোট হচ্ছে, তখন অতিমারি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, সব শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ও চিকিৎসকদের পরামর্শের ভিত্তিতে এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায় তা ঠিক করা যেত।

দ্রুততার সাথে সব ছাত্রকে যদি ভ্যাকসিন দেওয়া হত, তাদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হত, তা হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ লকডাউন করার প্রয়োজন হত না। সিলেবাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে কমিয়ে বিভিন্ন দিনে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত সময়ে নির্দিষ্ট কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস করানো যেত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারিভাবে স্যানিটাইজ করা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাস্ক, স্যানিটাইজার ও গ্লাভসের ব্যবস্থা করা যেত। সরকার এ বিষয়ে নীরব।

বিচারবিভাগ যেন আজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। হীরক রাজার মতো বর্তমান কেন্দ্র রাজ্য সরকার জনগণের শিক্ষার অধিকার হরণ করছে। ছাত্রদের জ্ঞানপিপাসু মনকে মেরে দিতে চাইছে। জনগণের অজ্ঞতাই এদের ক্ষমতার উৎস।

'এরা যত বেশি পড়ে
তত বেশি জানে
তত কম মানে'

এই আশঙ্কা থেকেই শাসকশ্রেণির মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার অধিকার হরণ করা। এতদিন ধরে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ড্রপ আউটের সংখ্যা বহু গুণ বেড়েছে। পুনরায় পড়াশোনায় মন বসার মতো পরিস্থিতি বহু ছাত্র-ছাত্রী থাকছে না। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। তাই এই পরিস্থিতিতে তাদের স্কুলমুখী করা অত্যন্ত জরুরি।

শ্যামল দত্ত
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

জীবনাবসান

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়-২ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কালিপদ পাড়ী দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষক থাকাকালীন ১৯৭৭ সালে কমরেড পঞ্চানন প্রধানের মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী সময়ে কমরেড সূর্য প্রধান যখন ওই এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্বে আসেন তখন অতি দ্রুত কমরেড পাড়ী সংগঠনের দায়িত্ব নিতে শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি পার্টি সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। বামফ্রন্ট শাসন ও পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকারের সময়ে, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা যে কোনও আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে কাজ করেছেন। স্থানীয়ভাবে কেলেঘাই নদী সংস্কার ও খরা বন্যা প্রতিরোধ, মদ জুয়া সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ ছিল। মনীষী জন্মজয়ন্তী, বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এলাকায় গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করতেন। নব্বইয়ের দশকে তিনি এআইকেকেএমএসের ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দায়িত্বের সাথে বিভিন্ন এলাকায় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। বয়স্ক এবং অসুস্থ অবস্থাতেও নেতৃত্বের আহ্বানে প্রতি সপ্তাহে ৫-৬ কিলোমিটার হেঁটে তিনটি হাটে ৮০ থেকে ১০০ কপি গণদাবী বিক্রি করতেন।

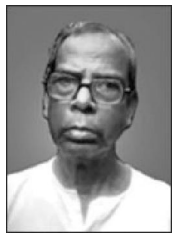

পরিবারে অর্থসংকট থাকলেও নেতাদের কাছে তা কখনও বলেননি। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন এলাকার মানুষকে খুবই আকর্ষণ করত। কোনও বিষয়ে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সমালোচিত হলে তা সর্বদাই তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করতেন।

কমরেড কালিপদ পাড়ীর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন স্তরের বহু মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সমবেত হন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন কমরেডস অমল মাইতি, নারায়ণ অধিকারী, সূর্য প্রধান, কমরেড তুষার জানা, কমরেড শ্যামাপদ জানা এবং জেলা ও লোকাল পার্টি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ।

কমরেড কালিপদ পাড়ীর মৃত্যুতে দল হারালো একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ একনিষ্ঠ কর্মীকে। এলাকার মানুষ হারালো তাদের একজন অত্যন্ত আপনজনকে। ১৩ জানুয়ারি তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড কালিপদ পাড়ী লাল সেলাম

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার দলের প্রবীণ পার্টি সদস্য হেঁটগুগুই লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ আচার্য ২২ ডিসেম্বর রাতে দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। এলাকায় তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

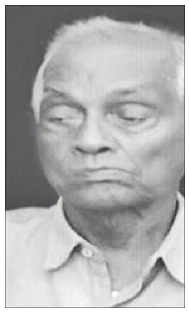

যৌবনে তিনি যখন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সেই সময় পুরুলিয়া জেলার প্রথম জেলা সম্পাদক কমরেড সাধু ব্যানার্জীর সংস্পর্শে এসে দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে আসেন। সেই সময় আরও বেশ কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষক দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা যৌথভাবে গ্রামে গ্রামে সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে দলীয় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কমরেড জগন্নাথ আচার্য। প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ ও তার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা হিসাবে এলাকার অনেকের কাছে তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন।

বর্তমানে এলাকায় যে নেতা কর্মী সংগঠক কাজ করছেন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন। দলের কর্মী, বিশেষত ছোটদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মমতা ও দরদবোধ। নিজের পরিবারকে বাইরে রেখে তিনি সংগঠনের কথা ভাবতেই পারেননি। পরিবারের সকলকেই কোনও না কোনও ভাবে দলের সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর বাড়িটাই এলাকায় দলীয় আদর্শের চর্চাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। আর ছিল তাঁর দুর্জয় সাহস।

এলাকায় স্থানীয় ঝাড়খণ্ড দলের প্রবল সন্ত্রাসের মধ্যেও নিজেকে, পরিবারকে ও এলাকার কর্মীদের যেভাবে সাহসের সাথে রক্ষা করেছিলেন তা শুধু এলাকার বর্তমান নেতা-কর্মীদেরই নয়, সাধারণ মানুষকেও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল জেলার সূচনা পর্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ পার্টি সংগঠককে হারালো।

কমরেড জগন্নাথ আচার্য
লাল সেলাম

নির্বাচন স্থগিতের দাবি প্রথম তুলেছিল এসইউসিআই (সি)

অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের চাপে রাজ্য সরকারের বিলম্বিত বোধোদয় ঘটল। রাজ্য সরকার চার পুরসভার নির্বাচন তিন সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া যে অত্যন্ত জরুরি ছিল তা ৬ জানুয়ারি লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই চিঠিতে বলেছিলেন, "এই নির্বাচন প্রসঙ্গে কমিশন কোভিড বিধি মানার কিছু ভাসা ভাসা নির্দেশিকা দিলেও তা প্রয়োগের প্রশ্নে যে একেবারেই ঢিলেঢালা তা স্পষ্ট হয়ে গেছে মনোনয়ন জমার পর্বেই। বড় মিছিল, রোড শো ইত্যাদি নিষিদ্ধ হলেও দেখা গেছে শাসকদলের বাহিনী তাসা বাজিয়ে বিপুল জমায়েত করে মনোনয়ন জমা করতে গেছে। বহু জনের মুখে মাস্কও ছিল না। কিন্তু কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সদ্য সমাপ্ত কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের সময়েও শাসক দল বা স্বীকৃত বিরোধী দলগুলিকে নিয়ম মানতে বাধ্য করার জন্য কমিশনের কার্যকরী ভূমিকা দেখা যায়নি।

আসন্ন নির্বাচনে সমাবেশ মিটিং মিছিলের জন্য কমিশন যে সব নির্দেশিকা দিয়েছে, তা সকলকে, বিশেষত শাসকদলকে মানাতে উদ্যোগী হবে এমন ভরসা কম। এমনিতেই ৫০০ লোকের জমায়েতে ছাড় দিয়ে কমিশন কোভিড বিপদ ডেকে আনার রাস্তা করেই রেখেছে। তার উপর বাড়ি বাড়ি প্রচার, সভা ইত্যাদি কোভিড সংক্রমণ বাড়াবেই তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এই পরিস্থিতিতে আমরা দাবি করছি, কোভিড সংক্রমণের ঢেউ নিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত ২২ জানুয়ারির ঘোষিত নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক।" ৬ জানুয়ারি এই চিঠি পাঠানোর পর নির্বাচন কমিশনের গয়ংগচ্ছ মনোভাব আরও সপ্তাহ খানেক ধরে চলতে থাকে। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (সি) নির্বাচন স্থগিতের দাবি জানিয়ে পোস্টার ছাপিয়ে ব্যাপক জনমত গঠনে নামে। সরকারের নির্বাচনসর্বস্ব মানসিকতার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জনমত গড়ে ওঠে। হাইকোর্টে মামলা হয়। অবশেষে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

গঙ্গাসাগর ঃ জনমোহিনী সিদ্ধান্তের বদলে দরকার ছিল জনস্বার্থের কথা ভাবা

লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে গঙ্গাসাগরে কোভিড বিধির সলিল সমাধি ঘটল। সংক্রমণ যে কোন স্তরে পৌঁছাবে সে আশঙ্কায় চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে সচেতন মানুষ উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী রাজ্য সরকার। এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় লোকসমাগম বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সে হুঁশিয়ারি থেকেও সরকার কোনও শিক্ষা নেয়নি। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১২ জানুয়ারি আবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি বলেন, গত ৫ জানুয়ারি আপনাকে এক চিঠির মাধ্যমে এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় লোকসমাগম বন্ধ করার দাবি করেছিলাম। সে দাবি মানা হয়নি। একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল ও তার ভিত্তিতে প্রশাসন যে নির্দেশ দিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল, কোথাও ৫০ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না, কোভিড বিধি মানতে হবে, সকলের র‍্যাপিড টেস্ট করা হবে, আরটিপিসিআর ও টিকাকরণের রিপোর্ট যাচাই হবে ইত্যাদি।

যেখানে ইতিমধ্যে ৫০ হাজার মানুষ এসেছেন এবং ৫ লক্ষ লোক সমাগম প্রত্যাশা করা হচ্ছে তখন এসব নির্দেশ পালন হবে কী ভাবে? তা যে হচ্ছে না সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে প্রশাসনের সেই পরিকাঠামো নেই। বিশেষ করে এত ভিড়ের সামান্য শতাংশও যদি সংক্রমিত হয় তাহলে সেই সংখ্যক মানুষকে নিভৃতাবাসে রাখা বা হাসপাতালে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা কোথায়?

রাজ্যে সংক্রমণের হার যখন লাফিয়ে বাড়ছে তখন মেলার পর এই হার কোথায় পৌঁছবে তা ভেবে আমরা শঙ্কিত। আমরা মনে করি, মেলা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী লোক সমাগম আটকানোর সময় এখনও আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি, জনমোহিনী সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এ বছর সরকার জনস্বার্থের কথা ভেবে এখনই মেলা বন্ধের নির্দেশ জারি করুক।

আমাদের প্রত্যাশা সার্বিক স্বার্থে আপনার সরকার অতি দ্রুত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের চিঠি

করোনা বিধি কঠোরভাবে চালু এবং প্রত্যেকের করোনা টেস্টের ব্যবস্থা, সমস্ত করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, লোকবল, অক্সিজেন, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান রাখা এবং ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ৪ জানুয়ারি চিঠি দেয় সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম। চিঠিতে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস গঙ্গাসাগর মেলা বন্ধ, পুর নির্বাচন ও জমায়েত বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ককর্মীদের নিরাপত্তার দাবি ইউনিটি ফোরামের

করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস ১০ জানুয়ারি পাঠানো ওই চিঠিতে দাবি জানান—সমস্ত শনিবার ও রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখতে হবে, ৫০ শতাংশ কর্মী দিয়ে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক খোলা রাখতে হবে, ব্যাঙ্ক কর্মীদের কোভিড পরীক্ষা, ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজের বন্দোবস্ত, আক্রান্ত কর্মীদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যাঙ্কে প্রত্যেককে স্যানিটাইজার, মাস্ক সরবরাহ করতে হবে।

মোবাইল রিচার্জের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

জিও, ভোডাফোন, এয়ারটেল সহ নানা বেসরকারি টেলিকম কোম্পানির ব্যাপক মুনাফা সত্ত্বেও নেট প্যাক ও রিচার্জের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে এআইডিওয়াইও। সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২২ সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করা হয় ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ৩ জানুয়ারি নেট প্যাক রিচার্জের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ট্রাই অফিসে গণ ই-মেইল পাঠানো হয়। দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাতে কয়েক হাজার মানুষ ইস্টার্ন জোনের ট্রাই দপ্তরে গণ ইমেল করেছেন। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কোর্ট মোড়ে (ছবি) এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি ওয়াই ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জি সহ জেলার নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বলেন, সরকারি টেলিকম সংস্থা বিএসএনএলকে অকেজো করে দিয়ে সম্পূর্ণ সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলোকে দখলদারি কায়েম করার সুযোগ করে দিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এর বিরুদ্ধে যদি ইমেইল এর মাধ্যমে প্রতিবাদী জনমতকে তোয়াক্কা না করা হয়, তা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

জীবনাবসান

ডায়মণ্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার লক্ষ্মীনারায়ণপুর দক্ষিণ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মানিক হালদার দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

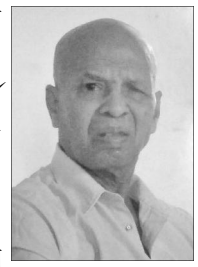

মন্দিরবাজার বিধানসভার এই প্রান্তিক অঞ্চলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের উদ্যোগে তেভাগা আন্দোলন, বেনাম জমি উদ্ধার ও গরিব মানুষের মধ্যে বন্টনকে কেন্দ্র করে জোতদার, কংগ্রেস, গুণ্ডা ও পুলিশদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সময় কমরেড রবীন মণ্ডলের সহায়তায় প্রয়াত কমরেড মানিক হালদারের পিতা কমরেড জগন্নাথ হালদার দলের সাথে যুক্ত হন এবং এই অঞ্চলে দলের বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে দলের চিন্তাকে সঞ্চারিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কমরেড মানিক হালদার এই আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন। ৭০-র দশকে জমি আন্দোলন এবং ৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলিত ভাবে এই এলাকায় গরিবদের বেনাম জমি কুক্ষিগত করে রাখলে এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনে সাহসের সাথে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন কমরেড মানিক হালদার। তিনি বেশ কয়েকবার জোতদার ও পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। তিনি চারবার পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবে জয়ী হন।

মানুষের প্রতিদিনের বিপদে-আপদে পাশে থাকতেন। আর্থিক অনটনের মধ্যেও পারিবারিক সমস্যা দেখা দিলে পার্টির কাজকে প্রাধান্য দিয়ে রূপায়ণ করতে এগিয়ে আসার বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে দল একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে হারালো।

৯ জানুয়ারি কিল্লা গ্রামে লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডায়মণ্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রেণুপদ হালদার সহ জেলা ও লোকাল কমিটির সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড নিতাই পাইক।

কমরেড মানিক হালদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ধানের সহায়ক মূল্যের দাবিতে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

ধানের সহায়ক মূল্য, অকাল বর্ষণে ধান-আলুর ক্ষতিপূরণ, নারেগা প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ ও ৪০০ টাকা মজুরি, বিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিসের দুর্নীতি ও দালালচক্র বন্ধ ও খরা প্রতিরোধে স্থায়ী সেচের দাবিতে এবং সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে ৩ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের ডাকে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া পাম্প মোড়ে পথ অবরোধ ও খাতড়া এসডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ৬ জনের প্রতিনিধি দল এসডিও-র কাছে ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক তারাশঙ্কর গোপ ও ব্লক নেতৃত্ব অশোক মণ্ডল, সঞ্জয় ভুঁইঞ্যা, শ্যাম কিস্কু ও নিরানন্দ সর্দার।

স্বরূপনগরে কৃষক সম্মেলন

দিল্লির সফল কৃষক আন্দোলনের শিক্ষা নিয়ে এরাজ্যের কৃষি জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সাথে স্থানীয় বিষয়গুলিকে যুক্ত করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার তাগিদ থেকেই ১৪ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার পাঁতুয়া লস্করপোতা প্রাইমারি স্কুলে অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের স্বরূপনগর ব্লক ৭ম সম্মেলন। ব্লক সভাপতি যুগল সেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সম্মেলনে নানা গ্রাম থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বেলা পাল কর্তৃক উত্থাপিত মূল প্রস্তাবের সমর্থনে ১২ জন কৃষক প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ, সম্পাদক দাউদ গাজী, জননেতা অজয় বাইন। গণসঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন গোবিন্দ সরকার ও জুলফিকার সরদার। যুগল সেনকে সভাপতি ও ছোটু মির্জাকে সম্পাদক করে ৩১ জনের স্বরূপনগর ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

রেল বেসরকারিকরণ

স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন

রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণ রোধ এবং স্টেশনের ন্যূনতম যাত্রী পরিষেবার দাবিতে ৮ জানুয়ারি হাওড়ার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে মৌড়িগ্রাম শাখা কমিটির উদ্যোগে স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অধ্যাপক বি আর প্রধান, অজয় চ্যাটার্জী, তাপস বেরা, প্রফুল্ল ঘোষ, শঙ্কর মাইতি, মাধব কর, দেবাশিস দাস সহ আরও অনেকে এই কর্মসূচিতে ছিলেন। দাবিগুলি ছিল রেলের বেসরকারিকরণ ও কর্মী সংকোচন করা চলবে না, সমস্ত লোকাল ট্রেন চালু করতে হবে, কোনও অজুহাতে ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো চলবে না, সময়মতো ট্রেন চালাতে হবে, স্টেশন সংলগ্ন অ্যাপ্রোচ রোড সারাতে হবে, ট্রেনের ঘোষণা করতে হবে, নিয়মিত ইউরিনাল সাফাই করতে হবে।

অতিবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি দ্রুত পূরণের দাবি কৃষকদের

মধ্যপ্রদেশের গুনা-অশোকনগরে কয়েকদিন ধরে অতিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে রবি শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে কৃষকদের ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুর্দশায় পড়েছেন। কিন্তু রাজ্যের বিজেপি সরকার নিশ্চুপ। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা।

খরিফ শস্য চাষেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল চাষিদের। তারা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিল, কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি সরকার। সংগঠনের পক্ষ থেকে মণীশ শ্রীবাস্তব হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকার কৃষকদের দাবি না মানলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

রেল স্টেশন বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের

সম্প্রতি উন্নয়নের কথা বলে রেলে ভাড়া বৃদ্ধির যে ঘোষণা রেল বোর্ডের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ'-র পক্ষ থেকে মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

'সম্প্রতি রেল বোর্ড স্টেশন ডেভেলপমেন্ট ফি-র নামে ট্রেনে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। প্রায় সমস্ত যাত্রীর বিশেষ করে দূরপাল্লার যাত্রীদের এই বাড়তি ভাড়া মেটাতে বাধ্য করা হবে। মাথাপিছু বাড়তি ১০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বেশি দিতে হবে তাদের। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম টিকিটের উপরও বাড়তি ১০ টাকা করে চাপানো হবে লেভি। এর সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে যুক্ত হবে জিএসটি। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোভিড অতিমারির আবহে সমস্ত সাধারণ মানুষ যখন আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছেন তখন রেল কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণা 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। যদিও এ-ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আপাতত লোকাল ট্রেনের দৈনিক ও সিজন টিকিটে এই লেভি কার্যকর হচ্ছে না এবং উন্নয়নীকৃত স্টেশনে কোনও যাত্রী ট্রেন থেকে ওঠা-নামা করলে তবেই ধার্য হবে এই অতিরিক্ত লেভি, কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা হল, এই নির্দেশিকা সম্প্রসারিত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রসঙ্গত কয়েক মাস আগে যে ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল ৪০০টি স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে রেল বোর্ডের বর্তমান ঘোষণা সব ধরনের যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কর্পোরেট সংস্থাগুলির পকেট ভরাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে জনগণের অতিমারির অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে একটার পর একটা বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তার বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের মানুষের এগিয়ে এসে প্রতিবাদে সামিল হওয়া অত্যন্ত জরুরি। রেলমন্ত্রীকে এই জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। উন্নয়নের দোহাই দিয়ে রেলভাড়া বৃদ্ধির যে জনবিরোধী ঘোষণা রেল বোর্ডের পক্ষ থেকে করা হয়েছে 'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ'র পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

মূল্য ঃ দশ টাকা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com